প্রবন্ধ

শিল্প

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2021

সূচি পত্র

- মন্দিরাভিমুখে 2
- শিল্প 11

মন্দিরাভিমুখে

ক্ষাত্রে নামক বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ের একটি দরিদ্র ছাত্র প্যারিস-প্লাস্টারের এক নারীমূর্তি রচনা করিয়াছেন; তাহার নাম দিয়াছেন মন্দিরাভিমুখে (To the Temple)। এই ব্যাপারটুকু লইয়া ইংরাজিপত্রে একটি ছোটোখাটো রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া গেছে।

স্যর জর্জ বার্ড্‌বুড্‌ সাহেবের নিকট এই মূর্তির দুখানি ফোটোগ্রাফ পাঠানো হয়। ফোটোগ্রাফ দেখিয়া তিনি তাঁহার “জর্নাল অফ ইন্ডিয়ান আর্টসঅ্যান্ড ইন্ডস্ট্রিজ’ নামক শিল্পবিষয়ক পত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া এক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মূর্তিটিকে প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীসীয় মূর্তি-সকলের সহিত তুলনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।হয়তো সহৃদয় বার্ড্‌বুড্‌ সাহেব তাঁহার ভারতবৎসলতা ও ভারতীয় শিল্পকলার ভাবী উন্নতি কল্পনার আবেগদ্বারা নীত হইয়া এই মূর্তি সম্বন্ধে কিছু অধিক বলিয়াছিলেন, সে কথা বিচার করা আমাদের সাধ্য নহে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি একটি ভুল করিয়াছিলেন। ফোটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারেন নাই যে মূর্তিটি খড়ি দিয়া গঠিত। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন ইহা পাথরের মূর্তি। অবশ্য উপকরণের পার্থক্যে শিল্পদ্রব্যের গৌরবের তারতম্য ঘটে এবং সেইজন্য খড়ির মূর্তির সহিত প্রাচীন পাথরের মূর্তির তুলনা করা হয়তো সংগত হয় নাই।

এই ছিদ্রটি অবলম্বন করিয়া কোনোঅ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখন “পায়োনিয়র’ কাগজে বার্ড্‌বুডের সমালোচনার বিরুদ্ধে এক সুতীব্র বিদ্রূপ-বিষাক্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে একটি মহারাষ্ট্রী ছাত্র-রচিত খড়ির মূর্তি লইয়া ইংরাজি সাময়িকপত্রের রঙ্গভূমিতে দুই ইংরাজ বোদ্ধার মধ্যে একটি ছোটোখাটো রকম রক্তপাত হইয়া গেছে।

আমরা যে এ স্থলে মধ্যস্থ হইয়া বিচারে অবতীর্ণ হইব এমন ভরসা রাখি না। আমরা একে আনাড়ি, তাহাতে পক্ষপাতী- আমরা যদি আমাদের স্বদেশীয় নবীন শিল্পীর রচনাকে কিছু বেশি করিয়াই মনে করি তবে আশা করি ভারতের নিমকে পালিত তীব্রতম ভারতবিদ্বেষীও তাহাত ক্ষুব্ধ হইবেন না।

অপরপক্ষে শিল্প সম্বন্ধে আমাদের মতো দীনহীন সম্প্রদায় আপাতত অল্পেই সন্তুষ্ট হইবে। সংস্কৃত ভাষায় একটা শ্লোক আছে_

পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি যবানাং প্রসৃতয়ে
স পশ্চাৎ সংপূর্ণঃ কলয়তি ধরিত্রীং তৃণসমাম।
অতশ্চানৈকান্ত্যদি গুরুলঘুতয়ার্থেষু, ধনিনাম্
অবস্থা বস্তূনি প্রথয়তি চ সংকোচয়তি চ॥

অর্থাৎ, দীন ব্যক্তি এইটুকু ইচ্ছা করিয়াই ক্ষান্ত হয় যে, তাহার যবের সঞ্চয়টুকু কিছু বাড়ুক, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন তখন তিনি ধরিত্রীকে তৃণসমান দেখেন। অতএব অর্থ সম্বন্ধে গুরুলঘুতার কোনো একান্ততা নাই; ধনীর অবস্থাই বস্তু-সকলকে কখনো বড়ো করিয়া তোলে কখনো বা ছোটো করিয়া আনে।

আমাদেরও সেই অবস্থা। আমাদের কোনো তরুণ প্রতিভান্বিত শিল্পী-রচিত মূর্তি প্রাচীন গ্রীসীয় মূর্তির সমকক্ষ না হইলেও আমরা সন্তুষ্ট থাকিব। যখন আমাদের দিন আসিবে, যখন ধরিত্রীকে তৃণসমান দেখিবার মতো অবস্থা আমাদের হইবে, তখন আমাদের ভালোমন্দ তুলনীয় বাটখারাও ওজনে বাড়িয়া চলিতে থাকিবে। এতএব য়ুরোপের কাছে যে জিনিস ছোটো আমাদের কাছে সে জিনিস যথেষ্ট বড়ো– কারণ ধনীর অবস্থাই বস্তু-সকলকে কখনো ছোটো করে, কখনো বড়ো করিয়া তোলে।

মাদ্রাজবাসী চিত্রশিল্পী রবিবর্মার দেশী ছবিগুলি যখন প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন তাহা যে পরিমাণ আনন্দ আমাদিগকে দান করিয়াছিল, ভাবী সমালোচকের অপক্ষপাত বিচারে তাহার সে পরিমাণ উৎকর্ষ প্রমাণিত হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহা বুভুক্ষিতের রিক্তখালীর উপর যবের মুষ্টি বর্ষণ করিয়াছিল- আপাতত সেই যবমুষ্টি ভবিষ্যতের পূর্ণোদর ব্যক্তির স্বর্ণমুষ্টির বেশি।

রবিবর্মার ছবিতে চিত্রকলা সম্বন্ধে কী সমস্ত অসম্পূর্ণতা আছে, সে-সকল বিচার আমরা যখন উপযুক্ত হইব, তখন করিব। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের যে আনন্দ তাহা শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যসম্ভোগের আনন্দ নহে, তাহা আশার আনন্দ। আমরা দেখিতেছি ভারতবর্ষের নিদ্রিত অন্তঃকরণের এক প্রান্তে সৌন্দর্যরচনার একটা চেষ্টা জাগিয়া উঠিতেছে। তাহা যতই অপরিস্ফুট অসম্পূর্ণ হউক-না-কেন, তাহা অত্যন্ত বিরাট আকারে আমাদের কল্পনাকে অভিভূত করিয়া তোলে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই যে-সকল যুগের ইতিহাসপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়া গেছে, যে সময়ে এক অপূর্ব শিল্পচেষ্টা ভারতের নির্জন গিরিগুহায় এবং দেবালয়ের পাষাণপুঞ্জমধ্যে আপনাকে অমরসুন্দর-আকারে প্রস্ফূটিত করিয়া তুলিতেছিল, সেই মূর্তিগড়া, মন্দিরগড়া, সেই ভাবুকস্পর্শে-পাথরকে-প্রাণ-দেওয়া যুগ ভবিষ্যতের দিগন্তপটে নূতন করিয়া প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে এই আশার আলোক জ্বালিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা যদি-বা আমাদের সূর্যচন্দ্র নাও হন তথাপি আমাদের স্বদেশের অন্ধ রজনীতে তাঁহারা এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের দিকে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। সম্ভবত সেই ভবিষ্যতের আলোকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র রশ্মিটুকু একদিন ম্লান হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহারা ধন্য।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোনো-এক সূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনো

ফিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনোই পরিত্যাগ করিবার নহে।

রাজ্যবিস্তারমদোদ্ধত ইংলন্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গোরুর মতো দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এশিয়া এবং আফ্রিকা তাঁহাদের ভারবহন এবং তাঁহাদের দুগ্ধ জোগাইবার জন্য আছে, কিড্ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

অদ্য আমাদের হীনতার অবধি নাই এ কথা সত্য কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরি করিয়া আসে নাই। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, কাল্ডিয়া, ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম ইঁহারাই জগতে সভ্যতার শিখা স্বহস্তে জ্বালাইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রপিক্সের অন্তর্গত, উষ্ণ সূর্যের করাধীন। সেই পুরাতন কালচক্র পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে পুনর্বার কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে তাহা স্ট্যাটিস্টিক্স্ এবং তর্কদ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ বড়ো বড়ো জাতির উন্নতি ও অধোগতি বিধির বিচিত্র বিধানে ঘটয়া থাকে, তার্কিকের তর্কশৃঙ্খল তাহার সমস্ত মাপিয়া উঠিতে পারে না; তাহার কম্পাসের অর্ধাংশ মাত্রের ভুল বিশাল কালপ্রান্তরে ক্রমশই বাড়িতে বাড়িতে সত্য হইতে বহু দূরে গিয়া বিক্ষিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অবান্তর কথা মনের আক্ষেপে আপনি উঠিয়া পড়ে। কারণ, যখন দেখিতে পাই ক্ষুধিত য়ুরোপ ঘরে বসিয়া সমস্ত উষ্ণভূভাগকে অংশ করিয়া লইবার জন্য খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিতেছেন তখন নিজদিগকে সম্পূর্ণ মৃতপদার্থ বলিয়া শঙ্কা হয়, তখন নিজেদের প্রতি নৈরাশ্য এবং অবজ্ঞা অন্তঃকরণকে অভিভূত করিতে উদ্যত হয়।

ঠিক এইরূপ সময়ে জগদীশ বসুর মতো দৃষ্টান্ত আমাদিগকে পুনর্বার আশার পথ দেখাইয়া দেয়। জগদীশ বসু জগতের রহস্যান্ধকারমধ্যে বিজ্ঞানরশ্মিকে কতুটুকু অগ্রসর

করিয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঠিকমতো জানি না এবং জানিবার শক্তি রাখি না, কিন্তু সেই সূত্রে আশা এবং গৌরবের উৎসাহে আমাদের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

ক্ষাত্রে-রচিত মূর্তিখানি দেখিয়া একজন বিদেশী গুণজ্ঞ প্রবীণ সমালোচক যখন উদারভাবে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন তখন শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা যতই মূঢ় হই, আশার পুলকে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বিদ্যুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্যের একটা মহৎ সুযোগ এই যে তাহার ভাষা সর্বজনবিদিত। অবশ্য তাহার সূক্ষ্ম গুণপনা যথার্থভাবে বুঝিতে বিস্তর শিক্ষা এবং চর্চার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাকে শুদ্ধমাত্র প্রত্যক্ষ করিতে বিশেষ কোনো বাধা অতিক্রম করিতে হয় না। এইজন্য ইহা বিনা-পরিচয়েই সমস্ত জগৎসভার মধ্যে আসিয়া খাড়া ইহতে পারে। অদ্য আমাদের মধ্যে যদি একজন প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করের অভ্যুদয় হয় তবে কল্যই তিনি বিশ্বলোকে প্রকাশলাভ করিবেন।

অতএব ভারতবর্ষ যদি শিল্পকলায় আপন প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করিতে পারে তবে জগৎ-প্রাসাদের একটা সিংহদ্বার তাহার নিকট দ্রুত উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

এ কথা অত্যন্ত প্রচলিত যে, “স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।’ যে বিদ্যার এই সর্বজনীনতা এবং সর্বকালীনতা আছে তাহা বিদ্বানকে পূজার যোগ্য করে। আমাদের দেশের পট-আঁকা যে চিত্রবিদ্যা তাহা প্রাদেশিক, তাহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য কেবলমাত্র সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। যখন আমাদের চিত্রবিদ্যাকে আমরা সর্বজনীন করিয়া তুলিতে পারিব, তখন সর্বজনসভায় স্থানলাভ করিয়া আমাদের মনুষ্যত্বে প্রসারিত হইবে।

ইহার উদাহরণ বাংলা সাহিত্য। অর্ধশতাব্দী পূর্বে পাঁচালী এবং কবির গানে এ সাহিত্য প্রদেশিক ছিল। মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের মতো প্রতিভাশালী লেখকগণ এই সাহিত্যকে সর্বজনীন ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। এখন এ সাহিত্য বাঙালির মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। এখন এই সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙালি জ্ঞানের স্বাধীনতা, কল্পনার উদারতা এবং হৃদয়ের বিস্তার অনুভব করিতেছে। এই সাহিত্য বাঙালির হৃদয়ে বিশ্বহিতৈষা, দেশানুরাগ এবং একটি গভীর বিপুল ও অধীর আকাঙক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে। এখন এ সাহিত্যের মধ্যে ভালো ও মন্দ, সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের যে আদর্শ আসিয়াছে তাহা প্রাদেশিক নহে তাহা সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাভাষা কেবল ভারতবর্ষের একটি অংশের ভাষা। এ ভাষা যদি ভারতের ভাষা হইত এবং বঙ্গসাহিত্য যদি ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি লোকের হৃদয়ের উপর দাঁড়াইতে পারিত, তবে ইহার মধ্যে যে কিছু অনিবার্য সংকোচ ও সংকীর্ণতা আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এ সাহিত্য কী বিপুল বলিষ্ঠ হইয়া উঠিত এবং জগতের মধ্যে কী বিপুল বল প্রয়োগ করিতে পারিত। এখনো যে বাংলা সাহিত্য সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব, প্রবল স্বাতন্ত্র্য ও গভীর পারমার্থিকতা লাভ করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ, অল্প লোকের সম্মুখে ইহা বিদ্যমান। এবং সেই অল্প লোক যদিও য়ুরোপীয় ভাবুকতার ব্যাপক আদর্শ বিদ্যালয়ে লাভ করিয়াছেন তথাপি তাহা যথার্থ আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা আপনাদের সাহিত্যকে ক্ষুদ্রভাবে দেখেন, তাহাকে ব্যক্তিগত উদ্‌ভ্রান্ত খেয়াল ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার সহিত বিচার করেন। সাহিত্য বাহিরের আকাশ হইতে যথেষ্ট আলোক ও বৃষ্টি পাইতেছে কিন্তু সমাজের মৃত্তিকা হইতে প্রচুর আহার্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।

সেজন্য আমরা নৈরাশ্য অনুভব করি না। কারণ, সাহিত্য গাছেরই মতো বৎসরে বৎসরে কালে কালে আপনারই পুরাতন চ্যুত পল্লবের দ্বারা আপনার তলস্থ ভূমিকে উর্বরা করিয়া তুলিবে।

কিন্তু চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যা যদিচ সাহিত্যের ন্যায় মানবপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ খাদ্য নহে তথাপি তাহাদের একটা সুবিধা এই আছে যে, যেদিন তাহারা আপনার প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা মোচন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবে সেইদিনই তাহারা বিশ্বলোকের। সেদিন হইতে আর তাহাদিগকে ব্যক্তিগত অহমিকা ও সম্প্রদায়গত মূঢ়তার মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। সমস্ত জগতের হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহারা আপনাকে দেশকালের অতীত করিয়া তুলিতে পারে।

অদ্য মহারাষ্ট্রদেশে কোনো নবীন কবি মানবের হৃদয়বীণার কোনো নূতন তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা আমরা বাঙালিরা জানি না এবং জানিতে গেলেও যথেষ্ট শিক্ষা ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ক্ষাত্রে-নামক একটি মারাঠি ছাত্র যে খড়ির মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন তাহার প্রতিমূর্তি আমরা প্রদীপের পত্রে বাঙালির সম্মুখে ধরিয়া দিলাম, বুঝিতে ও উপভোগ করিতে কাহারও কোনো বাধা নাই। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকে মারাঠিরা আপনাদের বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া এখনো জানেন না, কিন্তু ক্ষাত্রে যদি আপনার প্রতিভাকে সবলা করিয়া তুলিতে পারেন তবে অবিলম্বেই তিনি আমাদের ক্ষাত্রে হইবেন।

আমরা যদি এই মূর্তিটির সমালোচনার চেষ্টা করি তবে কিয়ৎপরিমাণে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র, কিন্তু তাহাকে সমালোচনা বলে না। এইরূপ একটি সুসম্পূর্ণ মূর্তি আদ্যোপান্ত মনের মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ কল্পনা করা যে কী অসামান্য ক্ষমতার কর্ম তাহা আমাদের মতো ভিন্ন-ব্যবসায়ীর ধারণার অগোচর। তাহার পরে সেই কল্পনাকে আকার দান করা– কোনো ক্ষুদ্রতম অংশও বাদ দিবার জো নাই, অঙ্গুলির নখাগ্রও নয়, গ্রীবাদেশের চূর্ণ কুন্তলও নয়– কাপড়ের প্রত্যেক ভাঁজটি, প্রত্যেক অঙ্গুলির ভঙ্গীটি স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে ও প্রত্যক্ষ করিয়া গড়িতে হইবে। মূর্তিটির সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে কোথাও কল্পনাকে অপরিস্ফুট রাখিবার পথ নাই। তাহার পরে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বসনভূষণ ভাবভঙ্গি সমস্ত লইয়া কেশের অবস্থান এবং পদাঙ্গুলির বিন্যাস পর্যন্ত সবটা মিলাইয়া মানবদেহের একটি অপরূপ সংগীত একটি সৌন্দর্যসামঞ্জস্য কল্পনার মধ্যে এবং সেখান হইতে জড়

উপকরণপিণ্ডে জাগ্রত করিয়া তোলা প্রতিভার ইন্দ্রজাল। বামপদের সহিত দক্ষিণ পদ, পদন্যাসের সহিত দেহন্যাস, বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ হস্ত, সমস্ত দেহলতার সহিত মস্তকের ভঙ্গি এইগুলি অতি সুকুমার নৈপুণ্যের সহিত মিলাইয়া তোলাই দেহসৌন্দর্যের ছন্দোবন্ধ। এই ছন্দোরচনার যে নিগূঢ় রহস্য তাহা প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করই জানেন এবং ক্ষাত্রে-রচিত মূর্তির মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বসনভূষণ বেশবিন্যাস এবং উদ্যতলঘুসুন্দর ভঙ্গিটির মধ্য হইতে সেই বিচিত্র অথচ সরল সংগীতটি নীরবে ঊর্ধ্বদেশে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, যেমন করিয়া একটি শুভ্র বিকচ রজনীগন্ধা আপন উদ্যত বৃন্তটির উপর ঈষৎ-হেলিত সরল ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া স্তব্ধনিশীথের নক্ষত্রলোকমধ্যে পরিপূর্ণতার একটি রাগিণী প্রেরণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম সমালোচনা করিতে গেলে কতকটা ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র, তাহাতে কোনো পাঠকের কিছুমাত্র লাভ হইবে কিনা সন্দেহ।

মূর্তিটির রচয়িতা শ্রীযুক্ত গণপত কাশীনাথ ক্ষাত্রের জীবন-সম্বন্ধে তাঁহার পত্রে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত হইবারই কথা। তাঁহার বয়স বাইশ মাত্র। তিনি জাতিতে সোমবংশী ক্ষত্রিয়। ক্ষাত্রে দেশীভাষা শিক্ষার পর ইংরাজি অল্পই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছবি আঁকা শিখিতে অত্যন্ত আকাঙক্ষা বোধ করাতে অন্য-সকল পড়া ছাড়িয়া ক্ষাত্রে বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবশ করেন। সেখানে তিনি সকল পরীক্ষাতেই ভালোরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বারংবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। বোম্বাই শিল্পপ্রদর্শনীতে মধ্যে মধ্যে মূর্তি প্রদর্শন করাইয়া ক্ষাত্রে অনেকগুলি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। “মন্দিরাভিমুখে’ নামক মূর্তি রচনা করিয়া ক্ষাত্রে বরোদার মহারাজার নিকট হইতে ২০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন; এই মূর্তিটি বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয় ১২০০ টাকায় ক্রয় করিয়া চিত্রশালায় রক্ষা করিয়াছেন। এরূপ মূর্তির কীরূপ মূল্য হওয়া উচিত তাহা আমাদের পক্ষে বলা অসাধ্য, কিন্তু ক্ষাত্রে ইহাকে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং সম্ভবত ইহা যৎকিঞ্চিৎই হইবে।

তরুণ শিল্পী আমাদের দেশে ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যার আদর নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেরূপ আক্ষেপ করিবার বিষয় অনেক আছে অতএব এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহাকে কোনোপ্রকার সান্ত্বনা দিতে পারি না। যখন আমাদের দেশে গুণী বাড়িবে এবং ধনীও বাড়িতে থাকিবে তখন ধনের দ্বারা গুণের আদর পরিমিত হইতে পারিবে। আপাতত আধপেটা খাইয়া আধা-উৎসাহ পাইয়া এমন-কি, গুণহীন অযোগ্যব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্বেষ-কুশাগ্রের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া আপনার কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে সকল অবস্থাই অনুকূল, সেখানে বড়ো হইয়া বিশেষ গৌরব নাই। আধুনিক য়ুরোপেও অনেক বড়ো বড়ো চিত্রলেখক ও ভাস্করকে বহুকাল অনাদর ও অনাহারের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে, ভাগ্যের সেই প্রতিকূলতাও বশীভূত শত্রুর ন্যায় প্রতিভাকে বহুতর বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছে।

দুই-একজন পার্সি ভদ্রলোক কাজ দিয়া ম্হাত্রেকে সাহায্য করিতেছেন। ম্হাত্রে আশা করেন বঙ্গভূমিও এরূপ সাহায্যদানে কৃপণতা করিবেন না।

প্রদীপ, পৌষ ১৩০৫

শিল্প

“ক্ষাত্রে” উপাধিকারী একটি মহারাষ্ট্রী ছাত্র “মন্দিরপথবর্তিনী’ (To the Temple) নামক একটি রমণীমূর্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহারই সম্মুখের ও পার্শ্বের দুইখানি ফোটোগ্রাফ ভারতীয় শিল্পকলার গুণজ্ঞপ্রবর সার্‌ জর্জ বার্ড্‌বুডের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। প্রস্তাব ছিল এই ছাত্রটিকে য়ুরোপে শিক্ষাদানের সুযোগ করিয়া দিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

তদুত্তরে উক্ত ভারতবন্ধু ইংরাজমহোদয় এই মূর্তির প্রচুর প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। তাহাতে প্রকাশ করেন, এই মূর্তিখানি গ্রীক ভাস্কর্যের চরমোন্নতিকালীন রচনার সহিত তুলনীয় হইতে পারে এবং বর্তমান য়ুরোপীয় শিল্পে ইহার উপমা মেলা দুস্কর। তাঁহার মতে যে শিল্পী য়ুরোপীয় কলাবিদ্যা না শিখিয়া নিজের প্রতিভা হইতে এমন একটি অপরূপ সৌন্দর্যের উদ্‌ভাবন করিতে পারিয়াছেন তাহার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্বে তাহাকে বিলাতে শিক্ষাদান না করাই শ্রেয়, কারণ য়ুরোপীয় শিল্পের অনুকরণে ভারতবর্ষের বিশেষ শ্রী, বিশেষ প্রাণটুকু অভিভূত হইয়া যাইতে পারে।

এইখানে বলা আবশ্যক, বার্ড্‌বুড সাহেব দুইটি ভুল করিয়াছিলেন। প্রথমত, তিনি ফোটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারেন নাই যে, মূর্তিটি প্রস্তরমূর্তি নহে, তাহা প্যারিস-প্লাস্টারের রচনা মাত্র। দ্বিতীয়ত, ক্ষাত্রে বোম্বাই আর্টস্কুলে য়ুরোপীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এই দুই ভ্রম উপলক্ষ করিয়া চিজ্‌হলম্‌ নামধারী কোনোঅ্যাংলো-ইন্ডিয়ান “পায়োনিয়র’ পত্রে বার্ড্‌বুড্‌ সাহেবের প্রতি কুটিল বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন– এবং ক্ষাত্রে-রচিত মূর্তির গুণপনা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াও তাহাকে খর্ব করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

শিল্প সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ কেন, অনারব্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে ভারতবর্ষীয় কাহারও অধিকার আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নবীন শিল্পীর অভ্যুদয়ে অমাদের চিত্ত আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

বার্ড্‌বুড্‌ সাহেব-কর্তৃক সম্পাদিত “ভারতশিল্প’ পত্রিকায় পূর্বোক্ত দুটি ফোটোগ্রাফ বাহির হইয়াছে। তাহা বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না। রমণীর উত্তান বাম বাহুতে একটি থালা ও অধোলম্বিত দক্ষিণ হস্তে একটি পাত্র উরুদেশে সংলগ্ন। তাহার দক্ষিণজানু সুন্দর ভঙ্গিতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া সুকুমার পদাঙ্গুলির অগ্রভাগে ধরণীতল স্পর্শ করিয়া আছে। তাহার দেবীতুল্য গঠনলাবণ্য নিবিড় নিবদ্ধ কঞ্চুলিকা ও কুটিলকুঞ্চিত অঙ্গবস্ত্র-দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়াও, অতিশয় মনোরম ভাবে সংবৃত। তরুণ মুখখানি আমাদের ভারতবর্ষেরই মুখ; সরল, স্নিগ্ধ, শান্ত এবং ঈষৎ সকরুণ। সবসুদ্ধ চিত্রখানি বিশুদ্ধ, সংযত এবং সম্পূর্ণ।

এই চিত্রটি দেখিতে দেখিতে আমাদের বহুকালের বুভুক্ষিত আকাঙক্ষা প্রতিক্ষণে চরিতার্থতা লাভ করিতে থাকে। সহসা বুঝিতে পারি যে, আমরা ভারতবর্ষীয় নারীরূপের একটি আদর্শকে মূর্তিমান দেখিবার জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সৌন্দর্যকে আমরা লক্ষ্মীরূপে সরস্বতীরূপে অন্নপূর্ণারূপে অন্তরে অনুভব করিয়াছি, কিন্তু কোনো গুণীশিল্পী তাহাকে অমর দেহদান করিয়া আমাদের নেত্রসম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন নাই।

দেশীয় স্ত্রীলোকের ছবি অনেক দেখা যায় কিন্তু তাহা প্রাকৃত চিত্র। অর্থাৎ যাহারা প্রতিদিন ঘরে বাহিরে সঞ্চরণ করে, খায় পরে, আসে যায়, জন্মায় মরে তাহাদেরই প্রতিকৃতি। যে নারী আমাদের অন্তরে বাহিরে, আমাদের সাহিত্য সংগীতে নিত্যকাল জাগ্রত, বংশানুক্রমে চিরপ্রবাহমান ভারতীয় নারীগণের মধ্যে স্থির হইয়া অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি বৈদিককালে সরস্বতীতীরে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে নবীনা ছিলেন

এবং যিনি অদ্য লৌহশৃঙ্খলিত গঙ্গাকূলে নবরাজধানীর ড্রয়িংরুম সোফাপর্যঙ্কেও তরুণী, সেই ভাবরূপিণী ভারত-নারী, যিনি সর্বকালে ভারতব্যাপিনী হইয়াও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহেন- তাঁহাকে প্রত্যক্ষগম্য করা আমাদের চিত্তের কামনা, আমাদের শিল্পের সাধনা। যে শিল্পী কল্পনামন্ত্রে সেই দেহের অতীতকে মূর্তির দ্বারা ধরিতে পারেন তিনি ধন্য।

ক্ষাত্রে-রচিত মূর্তির ছবিখানি দেখিলে মনে হয়, যে শুদ্ধশুচি ভক্তিমতী হিন্দুনারী চিরদিন মন্দিরের পথে গিয়াছে এবং চিরদিন মন্দিরের পথে যাইবে, এ সেই নামহীন জন্মহীন মৃত্যুহীন রমণী- ইহার সম্মুখে কোন্ এক অদৃশ্য নিত্য তীর্থদেবালয়, ইহার পশ্চাতে কোন্ এক অদৃশ্য নিত্য গৃহপ্রাঙ্গণ।

এই ছবির মধ্যে গ্রীসীয় শিল্পকলার একটা ছায়া যে পড়ে নাই,তাহা নহে। কিন্তু দেশীয় শিল্পীর প্রতিভাকে তাহা লঙ্ঘন করে নাই। বরঞ্চ তাহার সম্পূর্ণ অনুবর্তী হইয়া রহিয়াছে। ইহাকে ঠিক অনুকরণ বলে না। ইহাকে বরঞ্চ স্বীয়করণ নাম দেওয়া যায়। এইরূপ পরেরকে নিজের, বিদেশেরকে স্বদেশের, পুরাতনকে নূতন করিয়া লওয়াই প্রতিভার লক্ষণ।

ইংরাজি আর্টস্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই ছাত্রটির শিল্পবোধ উদ্‌বোধিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের বা ক্ষোভের কোনো কথা নাই। এবং তাহা হইতে এ কথাও মনে করা অকারণ যে, তবে তাহার রচনা মূলত য়ুরোপীয়।

ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে যাহাকে বলে শেক্‌স্‌পিরীয় যুগ তাহা তৎকালীন ইতালীয় ভাব-আন্দোলনের সংঘাত হইতে উদ্ভূত। তখন দেশীবিদেশীর সংস্রবে ইংরাজি সাহিত্যে খুব একটা আবর্ত জন্মিয়াছিল- তাহার মধ্যে অসংগত, অপরিণত, অপরিমিত, অনাসৃষ্টি অনেক জিনিস ছিল- তাহা শোভন সুসম্পূর্ণ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে অল্প সময় লয় নাই। কিন্তু সেই আঘাতে ইংলন্ডের মন জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং সাহিত্যকলার

অনেকগুলি বাহ্য আকার প্রকার, ছন্দ এবং অলংকার ইংরাজ আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিল। তাহাতে ইংরাজি সাহিত্যের ক্ষতি হয় নাই, বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমাদের মনকেও সুগভীর নিশ্চেষ্টতা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য একটি নূতন এবং প্রবল ভাবপ্রবাহের সংঘাত আবশ্যক হইয়াছিল। পশ্চিমের বেগবান ও প্রাণবান সাহিত্য ও শিল্পকলা সেই আঘাত করিতেছে। আপাতত তাহার সকল ফল শুভ এবং শোভন হইতে পারে না। এবং প্রথমে বাহ্য অনুকরণই স্বভাবত প্রবল হইয়া উঠে- কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের লক্ষ্মী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, অসংগতির মধ্যে সংগতি আনিবে- এবং সেই বিদেশী বন্যায় আনীত পলিমাটির ভিতর দিয়া দ্বিগুণ তেজে আপনারই শস্যগুলিকে অঙ্কুরিত, পুষ্পগুলিকে বিকশিত, ফলগুলিকে পরিণত করিয়া তুলিবে।

ইহা না হইয়া যায় না। আমাদের চতুর্দিকের বিপুল ভারতবর্ষ, আমাদের বহুকালের সুদূর ভারতবর্ষ, আমাদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভারতবর্ষকে নিরস্ত করিবার জো নাই। নূতন শিক্ষা ঝড়ের মতো বহিয়া যায়, বজ্রের মতো পতিত হয়, বৃষ্টির মতো ঝরিয়া পড়ে, আমাদের ভারতবর্ষ ধরণীর মতো তাহা গ্রহণ করে_ কতকটা সফল হয়, কতকটা বিফল হয়, কতকটা কুফলও হয়, কিন্তু সমস্ত ফলাফলের মধ্যে ভারতবর্ষ থাকিয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে আমরা ইংরাজি হইতে অনেক বাহ্য আকার প্রকার লাভ করিয়াছি। তাহার মধ্যে যেগুলি, অন্তরের ভাবপরিস্ফুটনের জন্য সর্বজনীন ও সর্বকালীন রূপে সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহাই থাকিয়া যাইবে। উপন্যাস লিখিবার ধারা আমরা ইংরাজি সাহিত্য হইতে পাইয়াছি, কিন্তু প্রতিভাশালী লোকের হস্তে সে উপন্যাস সম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস হইয়াছে। সূর্যমুখী বাঙালি, ভ্রমর বাঙালি, কপালকুণ্ডলা ঘরের সংস্রব ছাড়িয়া, মনের মধ্যে পালিতা হইয়াও কোনো ছদ্মবেশধারিণী ইংরাজি রোমান্সের নায়িকা নহে, সে বাঙালি বনবালিকা।

আসল কথা, প্রতিভা বৃহৎ বনস্পতির ন্যায়। নূতন-চাষ-করা আধহাত গভীর জমির মধ্যে শিকড় ঠেলিয়া, একটি বর্ষার ধারা এবং একটি শরতের রৌদ্র লইয়া অর্ধবৎসরের মধ্যে সে আপন জন্মমৃত্যু সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারে না। অনেক নিম্নে এবং অনেক দূরে তাহাকে অনেক শিকড় নামাইতে হয় তবেই সে আপনার উপযোগী রস ও প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে। সেই সুদূর এবং গভীর বন্ধন স্বভাবতই স্বদেশ ব্যতীত আর কোথাও হইতে পারে না। যতই শিক্ষা লাভ করি বিদেশের সহিত আমাদের উপরিতলের সম্বন্ধ- তাহার সর্বত্র আমাদের গতি নাই, আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু যুগ-যুগান্তর ও দূর-দূরান্তরের নিগূঢ় ও স্বাভাবিক সম্বন্ধবন্ধন ব্যাতীত বৃহৎ প্রতিভা কখনো আপনাকে দাঁড় করাইতে আপনাকে চিরজীবী রাখিতে পারে না। এইজন্য প্রতিভা স্বতই আপন স্বদেশের মর্মের মধ্যে মূল বিস্তার করিয়া সার্বলৌকিক আকাশের মধ্যে শিরোত্তোলন করিয়া থাকে।

কেবল সাহিত্যের প্রতিভা কেন, মহত্ত্বমাত্রেরই এই লক্ষণ। বাহ্য অনুকরণ, বিদেশীয় ধরনধারণের তুচ্ছ আড়ম্বর, এমন-কি, বিজাতীয় বিলাসবিভ্রমের সুখস্বচ্ছন্দতায় বৃহৎ হৃদয় কখনোই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

বিলাতি সমাজে বিলাতি ইতিহাসে যাহা গভীর, যাহা ব্যাপক, যাহা নিত্য- নকল বিলাতে তাহা যতই উজ্জ্বল ও দৃষ্টি-আকর্ষক হউক তাহা শুষ্ক সংকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাহাতে উদার হৃদয়ের সমস্ত খাদ্য ও সমস্ত নির্ভর নাই। এইজন্য আমাদের যে-সকল বাঙালি অকস্মাৎ আপাদমস্তক সাহেববিয়ানায় কণ্টকিত হইয়া চতুর্দিককে জর্জরিত করিয়া তোলেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, সাহেবের বারান্দায় বিলাতি টবে মেমসাহেবের বারিসিঞ্চনে তাঁহারা একটি একটি সৌখিন চারা পল্লবিত হইয়া দড়িবাঁধা অবস্থায় শূন্যে ঝুলিতেছেন- দেশের মাটির সহিত যোগ নাই, অরণ্যের সহিত সম্বন্ধ নাই এবং সেই বিচ্ছেদসূত্রেই তাঁহাদের অহংকার এবং দোদুল্যমান অবস্থা।কিন্তু অল্প খোরাকে যাহার চলে না, বহুমূল্য বিচিত্র চিনের টব অপেক্ষা দরিদ্র দেশের মাটি তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

অতএব শিক্ষার দ্বারা দ্বিগুণ বল ও নুতন ক্ষমতা লাভ করিলেও যথার্থ প্রতিভা স্বতই আপন প্রাণের দায়ে আপন নাড়ির টানে স্বদেশ হইতেই আপন অমৃতরস সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ক্ষাত্রে যদি যথার্থ প্রতিভাশালী হন, তবে তাঁহার জন্য ভাবনার কারণ নাই- তিনি তাঁহার রচনায়, তাঁহার প্রতিভাবিকাশে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় থাকিতে বাধ্য- তাঁহার আর অন্য গতি নাই। যদি তাঁহার প্রতিভা না থাকে তবে অসংখ্য ক্ষুদ্র অনুকারীদলের মধ্যে ক্ষমতা-বিকারের আর-একটি দৃষ্টান্ত বাড়িলে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি বিশেষ দেখি না।

কিন্তু শিক্ষা এবং রীতিমতো শিক্ষা আবশ্যক। উপকরণের উপর সম্পূর্ণ দখল না থাকিলেই অনুকরণের নিরাপদ গণ্ডির বাহিরে পদার্পণ করিতে বিপদ ঘটে। অল্প সাঁতার জানিলে ঘাটের আশ্রয় ছাড়িতে পারা যায় না, তটের কাছাকাছি ঘুরিতে ফিরিতে হয়। সকল বিদ্যারই যে একটি বাহ্য অংশ আছে তাহাকে একান্ত আয়ত্ত করিতে পারিলে তবেই তাহাকে স্বাধীন ব্যবহারের স্বকীয় ভাবপ্রকাশের অনুকূল করা যায়। ভাস্কর্যবিদ্যার বাহ্য নিয়ম কৌশল এবং কারিগরিটুকু যখন ক্ষাত্রের অধিকারগত এবং অনায়াসগম্য হইবে, তখন তাঁহার স্বদেশীয় প্রতিভা স্বাধীন সঞ্চরণের প্রশস্ত ক্ষেত্র লাভ করিবে, নতুবা তাঁহার রচনায় যখন-তখন পরকীয় আদর্শের ছায়া আসিয়া পড়িবে এবং তিনি অনুকরণবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না।

কিন্তু ক্ষাত্রে দরিদ্র ছাত্র। য়ুরোপের শ্বেতভুজা শিল্প-সরস্বতী তাঁহাকে ভূমধ্যসাগরের পরপার হইতে আপন ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন, বালক সে আহ্বান আপন অন্তরের মধ্যে শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে- কিন্তু তাহার পাথেয় নাই। যদি কোনো গুণজ্ঞ বিদেশী তাহার য়ুরোপীয় শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে প্রস্তুত হন তবে তাহা আমাদের দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইবে__ এবং স্বদেশী বিদেশী কেহই যদি প্রস্তুত না হন তবে তাহা আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

রুক্মিণীকান্ত নাগ নামক একটি বাঙালি ছাত্র কিছুদিন ইটালিতে শিল্প অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও উন্নতিলাভ করিতেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে আনাহারে দুরাযোগ্য রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহার সমস্ত আশা অকালে অবসান হয়। আমাদের এই শিল্পদরিদ্র দেশের পক্ষে এ মৃত্যু যেমন লজ্জাজনক তেমনি শোকাবহ।

অনেকে হয়তো জানেন না, শশিভূষণ হেশ নামক কলিকাতা আর্ট-স্কুলের একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী ছাত্র য়ুরোপে শিল্প অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন। মুক্তাগাছের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী তাহার সমস্ত খরচ জোগাইতেছেন। সেজন্য বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ!

ক্ষাত্রেও য়ুরোপ শিল্পশিক্ষালাভের অধিকারী- অসামান্য ক্ষমতা প্রকাশের দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। এক্ষণে দেশের লোক যদি আপন কর্তব্য পালন করে তবে বালকের উন্মুখী প্রতিভা পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়া দেশের লোককে ধন্য, ভারতবন্ধু বার্ড্‌বুডের উৎসাহবাক্যকে সার্থক এবং চিজ্‌হলম্‌ প্রমুখঅ্যাংলো-ইন্ডিয়ানগণের বিদ্বেষবিষাক্ত অবজ্ঞাকে অনন্তকালের নিকট ধিক্‌কৃত করিয়া রাখিবে।

ভারতী, আষাঢ়, ১৩০৫